ইউনিট-১

ভৌতরাশি ও পরিমাপ

Physical Quantity & Measurement

ভূমিকা

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে অজানা রহস্যের শেষ নেই। বিশ্ব প্রকৃতির এই অজানা বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য বিভিন্ন একক ব্যবহার করতে হয়, যা হবে সর্বজনগ্রাহ্য। এজন্য পরিমাপের এমন কিছু একক উদ্ভাবন করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। পরিমাপের জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্র, যেসব যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পদার্থের পরিমাপ করা যেতে পারে। যার ফলে বিজ্ঞানের সার্বিক প্রসার হয়েছে সম্ভবপর।

পাঠ-১: পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ (Evolution of Physics)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পদার্থবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদার্থবিজ্ঞান (Physics):

বিশ্ব প্রকৃতিতে যা কোন স্থান দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে পদার্থ বলে। আর বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থ এবং এদের প্রকৃতি ও শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেই শাখাকে পদার্থবিজ্ঞান বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে বস্তু ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিমাণগতভাবে ফলাফল প্রকাশ করাই হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য।

পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর (Scope of Physics):

বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিই হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান। বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে যা কিছু সংগঠিত হয় তার প্রায় সবই পদার্থবিজ্ঞানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলো ব্যবহার করে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাসমূহের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মৌলিক শাখা বলা হয়।
চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, প্রকৌশলশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সর্বত্র পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশদভাবে আলোচনা করার সুবিধার্থে পদার্থবিজ্ঞানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো-

১. বলবিজ্ঞান; ২.তাপ বিজ্ঞান; ৩. শব্দ বিজ্ঞান; ৪. আলোকবিজ্ঞান; ৫. চুম্বক বিজ্ঞান; ৬. তড়িৎ বিজ্ঞান; ৭. কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান; ৮. নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি।

পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ (Evolution of Physics) :

আধুনিক বিশ্ব বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের এই সফল প্রয়াস স্বল্প সময়ে ঘটেনি। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, গবেষণা, আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই সফলতা এসেছে। বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার মানব জাতিকে উন্নততর জীবন দান করেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নয়নে অবদান রেখে আসছেন।

বিজ্ঞানী থেলিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৪-৫৬৯) সূর্যগ্রহণ ও জ্যামিতি সম্পর্কে ধারণা দেন, তাকে Father of Science বলা হত।

পিথাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০-৪৯৫) ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তিনি বিভিন্ন জ্যামিতিক উপপাদ্য এবং সূত্র আবিষ্কার করেন। বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত বিষয়ক স্কেল সম্পর্কে তিনি কিছুটা ধারণা প্রদান করেন।

গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০) পদার্থের গঠন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, পদার্থের অবিভাজ্য একক রয়েছে। পরবর্তীতে তিনি এর নাম দেন এটম বা পরমাণু। তবে ডেমোক্রিটাসের পূর্বে বিজ্ঞানী লুসিপাস পরমাণু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী প্রদান করে ছিলেন।

বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস (খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৭-২১২) জ্যামিতি ও অংকশাস্ত্রে অনুরাগী ছিলেন। এছাড়া তিনি ধাতুর বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে সক্ষম হন এবং গোলীয় দর্পনের সাথে সূর্যরশ্মি প্রতিফলন ঘটিয়ে আগুন ধরানোর কৌশল আবিষ্কার করেন।

বিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আরবরা গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পারদর্শী ছিলেন। বিজ্ঞানী জাবির ইবনের হাইয়ান (৭২১-৮১৫ খ্রি.) রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শী এবং খোয়ারিজনি (৭৭০-৮৪০খ্রি.) গণিত বিষয়ের গবেষক ছিলেন। 'Algebra' শব্দটি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল জিবর ওয়াল মুকাবিলা থেকে উৎপত্তি।

ইবনে আল হাইয়াম (৯৬৫-১০৪০) ছিলেন একাধারে পদার্থবিদ ও গণিতবিদ। আলোক বিজ্ঞানে তাঁর অবদান রয়েছে। পারস্যদেশীয় পণ্ডিত আবু রাইয়ান আলবেরুনী (৯৭৩-১০৪৮) পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন।

রজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) পরীক্ষা মূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা প্রদান করেন। কিভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ ও এর সত্যতা যাচাই করা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা দেন।

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) ছিলেন মূলত একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি উড়োজাহাজের মডেল তৈরী করেছিলেন।

মূলত এর পরবর্তী সময় পদার্থবিজ্ঞানের আবিস্কারের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য। ডা. গিলবার্ট (১৫৪০-১৬০৩) চুম্বকত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। জার্মানীর বিজ্ঞানী স্নেল (১৫৯১-১৬২৬) প্রতিসরণের সূত্র আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী হাইগেনস (Huygens) (১৬২৬-১৬৯৫) আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। রবার্ট হুক (১৬৩৫-১৭০৩) পদার্থের স্থিতিস্থাপকতার সূত্র আবিষ্কার করেন। এছাড়া রবার্ট বয়েল (১৬২৭-১৬৯১) গ্যাসের সূত্র আবিস্কার করেন। রোমার (১৬৪৪-১৭১০) বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাণ করেন, যা তখনকার বিজ্ঞানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না।

নিকোলাস কোর্পানিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) একজন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনিই প্রথম ধারণা দেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। পরবর্তীতে জোহান কেপ্লার (১৫৭১-১৬৩০) গ্রহের গতি সম্পর্কিত সূত্র আবিস্কার করেন যা কেপলারের সূত্র নামে পরিচিত। তিনি প্রচলিত বৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণা পাল্টে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কল্পনা করেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২) কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক বলা হয়।তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে পরীক্ষণ এবং বিভিন্ন রাশির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ছাড়া কখনোই কোন ঘটনা গাণিতিকভাবে প্রমাণ করা যায় না।

আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। তিনি মহাকর্ষসূত্র, ব্যবকলন ক্যালকুলাসের নীতি প্রবর্তন করেন। এছাড়া তিনি আলোর কণাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি হচ্ছেন ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্স এর জনক।

অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আবিষ্কার ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটায়। জেমস্ ওয়াটের (১৭৩৬-১৮১৯) বাষ্পীয় ইঞ্জিন শিল্প বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড (১৭৭৭-১৮৫১) তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭), হেনরী (১৭৯৭-১৮৭৯), লেঞ্জ (১৮০৪-১৮৬৫) প্রমূখ বিজ্ঞানীগণ চৌম্বকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহ উৎপাদন করার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এটি ছিল যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরের কৌশল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। ১৮৬৪ সালে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯) আলোর তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের ধারণা দেন। তিনি তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র একত্র করে তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের বিকাশ ঘটান যা পরবর্তীতে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হেন্‌রিখ হার্জের (১৮৫৭-১৮৯৪) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়। ১৮৯৬ সালে বিজ্ঞানী মার্কনী (১৮৭৪-১৯৩৭) তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ ব্যবহার করে অধিক দূরত্বে সংকেত পাঠানোর পন্থা আবিষ্কার করেন। বাঙ্গালী বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুও (১৮৫৮-১৯৩৭) একই প্রকার পরীক্ষা নীরিক্ষা চালান। পরবর্তীতে বেতার যন্ত্র আবিষ্কার হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। ১৮৯৫ সালে রন্‌জেন (১৮৪৫-১৯২৩) এক্স-রে এবং বেক্‌রেল (১৮৫২-১৯০৮) আবিষ্কার করেন যে, কিছু কিছু পদার্থ থেকে স্বত:স্ফুর্ত ভাবে রশ্মি নির্গমনের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মেরী কুরী (১৮৬৭-১৯৩৪) এবং পিয়েরে কুরী (১৮৫৯-১৯০৬) এ ঘটনার নাম দেন তেজস্ক্রিয়তা। ১৮৯৭ সালে জে.জে. থমসন (১৮৫৬-১৯৪০) ইলেক্ট্রন আবিষ্কার করেন যা থেকে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভবপর ছিল।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানে আরো নতুন নতুন আবিষ্কার যুক্ত হয়। ম্যাক্স প্ল্যাংক (১৮৫৮-১৯৪৭) বিকিরণ সম্পর্কীত কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭১-১৯৫৫) আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রদান করেন। এছাড়া তিনি বিখ্যাত ভর-শক্তির সূত্র ($E=mc^2$) আবিষ্কার করেন।

১৯১১ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭) পরমাণু বিষয়ক নিউক্লিয় তত্ত্ব এবং নীলস্ বোর (১৮৮৫-১৯৬২) হাইড্রোজেন পরমাণু ইলেকট্রন স্তরের ধারণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞানে আরো উন্নতি সাধিত হয়।

১৯৩৮ সালে ওটো হান (১৮৭৯-১৯৬৮) ও স্ট্রেসম্যান (১৯০২-১৯৮০) প্রমাণ করেন যে, নিউক্লিয়াস ফিশনযোগ্য । অর্থাৎ ফিশনের ফলে একটি বড় ভর সংখ্যা বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে প্রায় সমান ভর বিশিষ্ট দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং প্রচুর শক্তি উৎপাদিত হয়। এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে নিউক্লিয় বোমা ও নিউক্লিয় চুল্লীর উদ্ভাবন হয়। নিউক্লিয়াস বিভাজন থেকে যে শক্তি উৎপাদন হয়, সেই শক্তির পরিমাণ বিপুল । এজন্য বর্তমান আধুনিক বিশ্ব নিউক্লিয় শক্তিকে শক্তির একটি প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করছে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তার তত্ত্ব বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব নামে পরিচিত। তার নামানুসারে বিশেষ এক শ্রেণির মৌলিক কণার নামকরণ করা হয়েছে 'বোসন' নামে।

ভারতীয় নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেংকটারমন (১৮৮৮-১৯৭০) রমন প্রভাব আবিষ্কার করেন। এছাড়া পাকিস্তানী বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬) তাড়িতচুম্বক বল ও দুর্বল পারমাণবিক বলের অভিন্নতা প্রদান করেন।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের পাশাপাশি বিজ্ঞানের অন্যসব শাখায়ও যথেষ্ঠ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসব উন্নয়নেও পদার্থবিজ্ঞান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে পদার্থবিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে বিভিন্ন জটিল রোগ নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারের দ্বারা মানুষ জয় করেছে প্রকৃতিকে। মানুষ চাঁদ থেকে শুরু করে মঙ্গল গ্রহে পদার্পন করেছে। মহাশূন্যে স্টেশন স্থাপন করে দিনের পর দিন মহাশূন্যে অবস্থান করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে পারছে যা গবেষণাতে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে তার মাধ্যমে অবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার ছাড়া আমরা একমুহূর্ত চিন্তা করতে পারি না। কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল, ইন্টারনেট, ডিজিটাল ক্যামেরা, আই প্যাড, ট্যাব ইত্যাদি আমাদের জীবন যাত্রাকেই পাল্টে দিয়েছে। আজকে বিশ্বের এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে বসে মুহূর্তেই পাচ্ছি তা একমাত্র বিজ্ঞানের অবদান।

পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য (Objective of Physics) ঃ

প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে পদার্থবিজ্ঞান (Role of Physics to reveal the mystery of Nature) :

পদার্থবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মৌলিক শাখা বলা হয়। এর নীতিগুলোর সাহায্যে অন্যান্য শাখাসমূহের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শক্তির সংরক্ষণনীতি পদার্থবিজ্ঞানের একটি মূল নীতি যা দিয়ে পরমাণুর অভ্যন্তরীন অবস্থা থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভব।
যদিও পদার্থ ও শক্তির রূপান্তর বিশদভাবে আলোচনা করাই পদার্থবিজ্ঞানের মূল কাজ। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করা। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মকভাবে আহিত নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শক্তি স্তরে ইলেকট্রনগুলো ঘুরতে থাকে। এর পরবর্তী গবেষণার ফলাফল হচ্ছে নিউক্লিয়াস প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছেন যে, প্রোটন ও নিউট্রন ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত রহস্য উন্মোচন করেই চলেছেন।
রসায়ন বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, সমুদ্র বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে মৌলিক ব্যাখ্যা ও ধারণা প্রদান করে। এছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রভূত ব্যবহার রয়েছে।

প্রকৃতির নিয়ম বর্ণনায় পদার্থবিজ্ঞান (Physics to describe the law of Nature):

মহাবিশ্বকে জয় করেছে পদার্থবিজ্ঞান। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাও কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মগুলোকে পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সূত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়। যেমন, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র, নিউটনের গতিসূত্র, শক্তির সংরক্ষণনীতি ইত্যাদি। মানুষ শিশুকাল থেকে প্রকৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করে প্রকৃতিকে মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করেন।

প্রকৃতির উন্নতি সাধনে পদার্থবিজ্ঞান (Physics to develope the Nature) :

আমরা আমাদের চারপাশে অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার দেখি। যেমন- টেলিভিশন, রকেট, উড়োজাহাজ, কৃত্রিম উপগ্রহ, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, সাবমেরিন, মহাশূন্যযান ইত্যাদি। এই যন্ত্রপাতিগুলো আবিষ্কার করতে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া এগুলোর কার্যপ্রণালী বুঝতে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান জানতে হবে।

মেধার বিকাশে পদার্থবিজ্ঞান (Physics for development of intellect):

পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে আমরা সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারি। কিভাবে চিন্তা করতে হয়, চিন্তাগুলোকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং যুক্তির মাধ্যমে কিভাবে বাস্তব রূপদান করতে হবে-পদার্থবিজ্ঞান তা শিখিয়ে দেয়। এছাড়া পদার্থবিজ্ঞান আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।
কিভাবে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল প্রকাশ করতে হয় পদার্থবিজ্ঞান পাঠ থেকে আমরা তা জানতে পারে।

স্থান ও কাল (Space and time):

স্থান ও কাল পদার্থবিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোন ঘটনা বর্ণনা করার জন্য স্থান ও কালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি ঘটনা কখন, কোথায় ঘটেছে তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য এই দুটি বিষয় অবশ্যই জানতে হবে। পদার্থ তথা বস্তু মাত্রই জায়গা দখল করে। বস্তুর অবস্থান কোথায় এবং কি পরিমাণ জায়গা দখল করে এসব তথ্যাদি জানার জন্য প্রাচীনকাল থেকে স্থান সম্পর্কে একটি ধারনা পাওয়া যায়। এছাড়া কোন ঘটনা কখন ঘটেছে, কোন ঘটনাটি আগে ঘটেছে এবং কোনটি পরে তা ব্যাখ্যা করতে সময় জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রাচীনকাল থেকে স্থান ও কাল সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা ধারণা দিয়ে আসছেন।

ইউক্লিডের ধারণা (Concept of Euclide):

সর্বপ্রথম ইউক্লিড স্থান সম্পর্কে জ্যামিতিক ধারণা উপস্থাপন করেন। আমাদের চারপাশে যা আছে সবই স্থান।

গ্যালিলিও এর ধারণা (Concept of Gallileo):

গ্যালিলিও স্থান ও কালকে তার গতি ও ত্বরণের সূত্রে ব্যবহার করছেন। ফলে পদার্থবিজ্ঞানে স্থান ও কাল গুরুত্বপূর্ণ রাশি হিসেবে গাণিতিক সমীকরণে প্রবেশ করছে।

নিউটনের ধারণা (Concept of Newton):

নিউটনের বলবিদ্যার মাধ্যমে স্থান ও কালের ধারণা পরিমাণগত এবং সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। নিউটনীয় বা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে স্থান হচ্ছে ত্রিমাত্রিক বিস্তৃতি। এর কোন শুরু বা শেষ নেই। এর বিস্তৃতি অসীম। স্থানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। স্থানের যেকোন এলাকা অন্য এলাকা থেকে অভিন্ন অর্থাৎ স্থান সমসত্ত্ব। স্থান নিরপেক্ষ। সমস্ত ঘটনা স্থানের মধ্যে ঘটে এবং সমস্ত বস্তুর অবস্থান ও স্থানের বিস্তৃতির মধ্যে থাকে, কিন্তু স্থান কোন বস্তু বা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না অর্থাৎ নিরপেক্ষ। স্থান শুধু বস্তু ও ঘটনা নিরপেক্ষ নয়, সময় নিরপেক্ষও বটে। এজন্য কালের প্রবাহ স্থানকে পরিবর্তন করতে পারে না।

নিউটনের ধারণা মতে সময় তার নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হয়। কোন বস্তু বা ঘটনা দ্বারা সময়ের প্রবাহ প্রভাবিত হয় না। এর কোন শুরু বা শেষ নেই। সময়কে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। এর যে কোন অংশ অন্য অংশের অনুরূপ। এজন্য কোনো পরীক্ষা যখনই সম্পাদন করা হোক না কেন তা সময় নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল নয়। সময় স্থান নিরপেক্ষ।

নিউটনের স্থান-কালের ব্যাখ্যা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব ত্রিমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক সময় নিয়ে গঠিত। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে এর নতুন ধারণা পাওয়া যায়।

সার-সংক্ষেপ:

- **পদার্থ:** প্রকৃতিতে যা কোন স্থান দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে পদার্থ বলা হয়।
- **স্থান ও কাল:** বস্তুর অবস্থান জানার জন্য যা প্রয়োজন হয় তাকে স্থান বলে। আবার কোন ঘটনা কখন ঘটছে বা কোনটি আগে ঘটছে অথবা কোনটি পরে ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে সময়ের প্রয়োজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের উদ্ভব কখন ঘটে?

ক) অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে
গ) বিংশ শতাব্দীতে ঘ) একবিংশ শতাব্দীতে

২. স্থান ও কাল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন-

i) নিউটন ও ইউক্লিড
ii) গ্যালিলিও ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু
iii) ইউক্লিড ও গ্যালিলিও

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ঃ ২ ভৌত রাশি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ভৌত রাশি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মৌলিক রাশি এবং লব্ধ রাশি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাশির মাত্রা হিসাব করতে পারবেন।

ভৌত রাশিঃ

এই বিশ্ব প্রকৃতির যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে রাশি বলা হয়। যেমন একটি লোহার বলের ভর পরিমাপের করা যায়। ভর একটি রাশি। আবার কাপড়ের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় যেখানে দৈর্ঘ্য একটি রাশি। পানির তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়, তাহলে পানির তাপমাত্রাও একটি রাশি। বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে কত সময় লাগে সেই সময়ও একটি রাশি। এই ভৌত জগতে এরূপ বহু রাশি রয়েছে। এ সকল রাশির মধ্যে কয়েকটি রাশি রয়েছে যেগুলো পরিমাপ করার জন্য অন্য কোন রাশির উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না। এ রাশি গুলোকে মৌলিক রাশি বলা হয়। যেমন সময় মাপতে অন্য কোন রাশির উপর নির্ভর করতে হয় না। সুতরাং সময় একটি মৌলিক রাশি।

অপরদিকে, এমন অনেক রাশি আছে যেগুলো মাপার জন্য অন্য রাশির দরকার হয়। যেমন বেগ পরিমাপের জন্য দূরত্ব এবং সময় এই রাশি দুটি জানার প্রয়োজন হয়। অত:পর দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করে বেগের মান বের করতে হয়। এর থেকে বুঝা যায় যে, বেগ একটি লব্ধ বা যৌগিক রাশি। অতএব এটা প্রতীয়মান হয় যে, কিছু কিছু মূল রাশি আছে, যেগুলো অন্য রাশির উপর নির্ভরশীল নয়। এসব রাশিগুলোকে মৌলিক রাশি বলা হয়।

জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিজ্ঞানীরা পরিমাপের ক্ষেত্রে এরূপ সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো দৈর্ঘ্য, ভর, সময়,তাপমাত্রা, তড়িৎপ্রবাহ, দীপন তীব্রতা এবং পদার্থের পরিমাণ।

যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মৌলিক রাশি থেকে পাওয়া যায়, তাদেরকে লব্ধ রাশি বলা হয়।

বেগ, ত্বরণ, কাজ, বল, তাপ, বিভব ইত্যাদি লব্ধ রাশির উদাহারণ। যে গুলো মৌলিক রাশি থেকে গঠিত হয়।

যেমন: কাজ = বল × সরণ

$$= \text{ভর} \times \text{ত্বরণ} \times \text{সরণ} = \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^২} \times \text{সরণ} = \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}^২}{\text{সময়}^২}$$

সুতরাং কাজ একটি লব্ধ রাশি বা যৌগিক রাশি।

মাত্রা (Dimension) :

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, ভৌত রাশিগুলো এক বা একাধিক মৌলিক রাশি দ্বারা গঠিত হয়। সুতরাং যে কোনো ভৌত রাশিকে বিভিন্ন সূচকের এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা হয়। কোনো ভৌত রাশিতে বিদ্যমান মৌলিক রাশি গুলোর সূচককে রাশিটির মাত্রা বলে। মৌলিক রাশি দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়কে যথাক্রমে L, M ও T দ্বারা প্রকাশ করা হয়। L কে দৈর্ঘ্যের মাত্রা, M কে ভরের মাত্রা, T কে সময়ের মাত্রা বলে।

যেমন, বল = ভর × ত্বরণ

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} \qquad = \text{ভর} \times \frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{সময়}^২} \quad = \mathrm{M} \times \frac{\mathrm{L}}{\mathrm{T}^2} = \mathrm{MLT}^{-2}$$

সুতরাং, বলের মাত্রা MLT^{-2}। অর্থাৎ বলের রয়েছে ভরের মাত্রা (M), দৈর্ঘ্যের মাত্রা (L) এবং সময়ের মাত্রা (T)।

যে সমীকরণের সাহায্যে কোন রাশির মাত্রা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাকে মাত্রা সমীকরণ বলে। মাত্রা সমীকরণে মাত্রা নির্দেশ করতে তৃতীয় বন্ধনী [ ] ব্যবহার করা হয়। যেমন, বলের মাত্রা সমীকরণ হল, $[F] = [MLT^{-2}]$

২.৩-৩ সারণীতে বিভিন্ন রাশির মাত্রা দেখানো হল। মাত্রা সমীকরণের সাহায্যে আমরা কোন ভৌত রাশির একক নির্ণয় করতে এবং সমীকরণের শুদ্ধতা পরীক্ষা করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নের সমীকরণটি বিবেচনা করতে পারি।

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

কেবলমাত্র একই জাতীয় রাশির যোগ, বিয়োগ বা সমতা সম্ভব। সুতরাং একটি সমীকরণের প্রতিটি পদকে অবশ্যই একই জাতীয় রাশিকে নির্দেশ করতে হবে। উপরের সমীকরণটিতে তিনটি পদ আছে। বামদিকে একটি এবং ডানদিকে দুটি। এই সমীকরণে s হল সরণ।

সুতরাং, s এর মাত্রা হল L

u হল আদিবেগ, এর মাত্রা= $\frac{L}{T} = LT^{-1}$

a হল ত্বরণ, এর মাত্রা= $\frac{L}{T^2} = LT^{-2}$

t হল সময়, এর মাত্রা= T

$\therefore$ ut এর মাত্রা= $LT^{-1} \times T = L$

এবং at^2 এর মাত্রা= $LT^{-2} \times T^2 = L$

সুতরাং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উক্ত সমীকরণটির বামদিকের পদটির মাত্রা L এবং ডানদিকের দুটি পদের মাত্রাও L। সুতরাং সমীকরণটি সিদ্ধ।

সার সংক্ষেপ ঃ

- **মৌলিক রাশিঃ** দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তাপমাত্রা, তড়িৎপ্রবাহ, দীপন তীব্রতা, পদার্থের পরিমাণ- এই সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি বলে। রাশিগুলোকে পরিমাপ করতে অন্য কোন এককের উপর নির্ভর করতে হয় না।
- **লব্ধ রাশিঃ** যে রাশিগুলো মৌলিক রাশির উপর নির্ভরশীল তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে। যেমন- বেগ, কাজ, ত্বরণ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোনটি লব্ধ রাশির উদাহরণ?

ক) কাজ খ) ভর গ) সময় ঘ) তাপমাত্রা

২. মাত্রা সমীকরণের সাহায্যে-

i) ভৌত রাশির একক নির্ণয় করা যায়
ii) সমীকরণের সত্যতা যাচাই করা যায়
iii) গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ঃ ৩ পরিমাপ ও একক (Measurement and Unit)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরিমাপ ও এককের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে মৌলিক এককগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- এককের বিভিন্ন উপসর্গ ব্যবহার করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক সংকেত ও একক লেখার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিমাপের একক :

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য মাপ জোখের প্রথা উদ্ভাবন করেন। অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি কাজের সাথে মাপ জোখের ব্যাপারটি জড়িত রয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন গবেষণার কাজে সূক্ষ্ম মাপ জোখের প্রয়োজন হয়। মাপ জোখের এই বিষয়টিকে বলা হয় পরিমাপ। অর্থাৎ পরিমাপ বলতে বুঝায় কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। যেমন রুবি দোকান থেকে ১লিটার দুধ কিনল। রুপম প্রতিদিন সকালে ২ কিলোমিটার দৌড়াঁয়, প্রীতমের বাসা থেকে স্কুলে যেতে ১৫ মিনিট সময় লাগে। এখানে ১ লিটার হলো দুধের আয়তন এবং ২ কিলোমিটার হলে দূরত্বের পরিমাণ এবং ১৫ মিনিট হলো সময়ের পরিমাণ। অর্থাৎ কোনো কিছু পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে দুটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। একটি হলো সংখ্যা অন্যটি হলো একক।

যে কোন ভৌত রাশির পরিমাপের জন্য তার একটি নিদিষ্ট পরিমাণকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয় এবং এই পরিমাণের সাপেক্ষে সমগ্র ভৌত রাশিটির পরিমাপ করা হয়। এ আদর্শ পরিমাণকে ঐ রাশিটির একক বলা হয়। মনে করা যাক একটি ট্রেনের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার। এখানে, মিটার হল দৈর্ঘ্যের একক এবং ট্রেনের দৈর্ঘ্য উক্ত একক দূরত্বের ১০০গুণ। বিভিন্ন ভৌত রাশি যেমন, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ওজন, কোণ, সময়, বল, তাপ, শক্তি ইত্যাদি পরিমাপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন একক রয়েছে এবং পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতিতে এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। এ এককগুলো আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সুতরাং যে আদর্শ পরিমাপের সাথে তুলনা করে ভৌত রাশিকে পরিমাপ করা হয় তাকে পরিমাপের একক বলা হয়।

মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড, নিউটন, জুল ইত্যাদি পরিমাপের এককের উদাহরণ।

এস.আই. (SI) এর মৌলিক একক সমূহঃ

যেহেতু মৌলিক রাশির একক সমূহ অন্য কোনো এককের উপর নির্ভর করে না, তাই মৌলিক একক ইচ্ছামত নির্বাচন করা যায়। তবে নির্বাচিত এককগুলোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকতে হবে এবং এই একক গুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেমন, এটি হবে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কোন কিছুর উপর নির্ভর করবে না। কালের বিবর্তনে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে এর কোন পরিবর্তন হবে না। সহজে এককটি পূনরুৎপাদন করা যাবে। 1960 সালে এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর সময় মৌলিক একক গুলোর যে আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করা হয়েছিল পরবর্তীকালে উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এদের মধ্যে অনেক এককের আদর্শ বদল করা হয়েছে কিন্তু তাতে এককগুলোর মানের কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। যেমন 1900 সালে ট্রপিক্যাল বৎসরের উপর ভিত্তি করে সময়ের একক সেকেন্ড এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সিজিয়াম পরমাণুর পারমাণবিক পরিবৃত্তির উপর ভিত্তি করে সেকেন্ডের সংজ্ঞা প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে মৌলিক এককগুলোর জন্য সর্বশেষ গৃহীত আদর্শ নিম্নে বর্ণনা করা হল।

দৈর্ঘ্যের একক ঃ মিটার

বায়ুশূন্য স্থানে আলো $\frac{1}{299,792,458}$ সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, সে দূর কে 1 মিটার (m) বলা হয়।

ভরের একক ঃ কিলোগ্রাম

ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওয়েট্স এন্ড মেজারস্ এ সংরক্ষিত প্লাটিনাম ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর তৈরি একটি সিলিন্ডারের ভরকে 1 কিলোগ্রাম (kg) বলে। এই সিলিন্ডারটির উচ্চতা ও ব্যাস উভয়েই 3.9 cm।

সময়ের একক ঃ সেকেন্ড

একটি সিজিয়াম পরমানুর (^{133}Cs) 9,192,631,770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে 1 সেকেন্ড (s) বলে।

তাপমাত্রার একক ঃ কেলভিন

পানির ত্রৈধ বিন্দুর (triple point) তাপমাত্রার $\frac{1}{273.16}$ ভাগকে 1 কেলভিন (K) বলে।

তড়িৎ প্রবাহের একক : অ্যাম্পিয়ার ঃ

শূন্য মাধ্যমে 1m দূরত্বে অবস্থিত অসীম দৈর্ঘ্যের এবং উপেক্ষনীয় প্রস্থচ্ছেদের দুটি সমান্তরাল সরল পরিবাহীর প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ চললে পরস্পরের মধ্যে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 2×10^{-7} N নিউটন বল উৎপন্ন হয় তাকে 1 ampere বলে।

দীপন তীব্রতার একক ঃ ক্যান্ডেলা

ক্যান্ডেলা হচ্ছে সেই পরিমাণ দীপন তীব্রতা যা কোনো আলোক উৎস একটি নির্দিষ্ট দিকে 540×10^{12} হার্জ কম্পাঙ্কের এক বর্ণী বিকিরণ নিঃসরণ করে এবং ঐ নির্দিষ্ট দিকে তার বিকিরণ তীব্রতা হচ্ছে প্রতি স্টেরোডিয়ান ঘনকোণে $\frac{1}{863}$ ওয়াট।

পদার্থের পরিমাণের একক ঃ মোল

যে পরিমান পদার্থে 0.012 কিলোগ্রাম কার্বন-১২ এ অবস্থিত পরমাণুর সমান সংখ্যক প্রাথমিক ইউনিট (যেমন পরমাণু, অণু, আয়ন, ইলেকট্রন ইত্যাদি বা এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো গ্রুপ) থাকে তাকে 1 মোল বলে।

সারণিঃ ৩.১ : মৌলিক রাশি ও তাদের একক

ক্রমিক নং	রাশি	রাশির প্রতীক	এস. আই একক	এককের প্রতীক
১.	দৈর্ঘ্য (length)	l	মিটার (meter)	m
২.	ভর (mass)	m	কিলোগ্রাম (kilogram)	kg
৩.	সময় (time)	t	সেকেন্ড(second)	s
৪.	তাপমাত্রা (temperature)	θ, T	কেলভিন (kelvin)	K
৫.	তড়িৎ প্রবাহ (electrict current)	I	অ্যাম্পিয়ার (ampere)	A
৬.	দীপনতীব্রতা (luminious intensity)	I_v	ক্যান্ডেলা (candela)	Cd
৭.	পদার্থের পরিমাণ (amount of substance)	n	মোল (mole)	mol

এককের গুণিতক ও উপগুণিতক :

অনেক সময় ব্যবহার ও বুঝার সুবিধার্থে মৌলিক এককগুলোর গুণিতক ও উপগুণিতক ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীরা এমন অনেক রাশি ব্যবহার করে থাকেন যেগুলোর মান খুব ছোট বা বড় হয়ে থাকে। যেমন আলোর দ্রুতি প্রায় 30,00,00,000 ms^{-1}। এই জাতীয় রাশির সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই পড়া, লেখা, বুঝা এবং মনে রাখা খুবই অসুবিধাজনক। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য 10 সংখ্যাটির ঘাত (power) ব্যবহার করা। তাহলে আলোর দ্রুতিকে লেখা যায় $3\times10^{8}ms^{-1}$। আবার ধরা যাক দুটি কণার মধ্যকার দূরত্ব 0.0000000001 m। কিন্তু এই সংখ্যাটিকে যদি একটি উপসর্গ ব্যবহার করে লিখি তাহলে সংখ্যাটি হবে 0.1×10^{-9}m বা 0.1 nm।

সারণী : ৩.২ : দশের সূচক সমূহ

উপসর্গ	উৎপাদক	সংকেত	উদাহরণ
এক্সা (exa)	10^{18}	E	1 এক্সা মিটার =1 Em =10^{18}m
পেটা (peta)	10^{15}	P	1 পেটা মিটার =1 Pm =10^{15}m
টেরা (tera)	10^{12}	T	1 টেরা গ্রাম =1 Tg =10^{12}g
গিগা (giga)	10^{9}	G	1 গিগা জুল =1 GJ =10^{9}J
মেগা (mega)	10^{6}	M	1 মেগা ওয়াট =1 MW =10^{6}W
কিলো (kilo)	10^{3}	k	1 কিলোভোল্ট =1 kV =10^{3}V
হেক্টো (hecto)	10^{2}	h	1 হেক্টো প্যাসকেল =1 hPa =10^{2}Pa
ডেকা (deca)	10^{1}	da	1 ডেকা নিউটন =1 daN =10^{1}N
ডেসি (deci)	10^{-1}	d	1 ডেসি ওহম =1 dΩ =$10^{-1}\Omega$
সেন্টি (centi)	10^{-2}	c	1 সেন্টিমিটার =1 cm =10^{-2}m
মিলি (milli)	10^{-3}	m	1 মিলি অ্যাম্পিয়ার =1 mA =10^{-3}A
মাইক্রো (micro)	10^{-6}	μ	1 মাইক্রো ভোল্ট =1 μV =10^{-6}V
ন্যানো (nano)	10^{-9}	n	1 ন্যানো সেকেন্ড =1 ns =10^{-9}s
পিকো (pico)	10^{-12}	p	1 পিকো ফ্যারাড =1 pF =10^{-12}F
ফেমটো (femto)	10^{-15}	f	1 ফেমটো মিটার = 1 fm =10^{-15}m
অটো (atto)	10^{-18}	a	1 অটো ওয়াট = 1 aW =10^{-18}W

কোনো সংখ্যাকে 10 এর যে কোন ঘাত এবং 1 থেকে 10 এর মধ্যে অবস্থিত অপর সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা হলে তাকে বৈজ্ঞানিক প্রতীক বলে। যেমন,5800000 হল 5.8×10^{6} এবং 0.0000000956 হল 9.56×10^{-8}। তাহলে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যাটির 10 এর ধনাত্মক সূচক যত, দশমিক বিন্দুকে ডান দিকে তত ঘর সরালে মূল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। অনুরূপভঅবে 10 এর ঋণাত্মক সূচক যত, দশমিক বিন্দুকে বাম দিকে তত ঘর সরালে মূল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

বৈজ্ঞানিক প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যার ক্ষেত্রে গুণের নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়মটি প্রযোজ্য:

$$10^{m}\times10^{n}=10^{m+n}$$

এখানে m এবং n যে কোন সংখ্যা, যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে।

যেমন,

$$10^{5}\times10^{9} = 10^{14,}\ \ 10^{3}\times10^{-7} = 10^{-4}$$

ভাগের ক্ষেত্রেও নিয়মটি প্রযোজ্য :

$$10^{m}\div10^{n}=10^{m-n,}\ \ 10^{8}\div10^{5} = 10^{8-5}=10^{3},\quad 10^{8}\div10^{-12} = 10^{8-(-12)} = 10^{20}$$

বৈজ্ঞানিক প্রতীক ও সংকেতঃ

পদার্থবিজ্ঞানকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন হয় গণিতের। গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে আমরা প্রকাশ করে থাকি। পদার্থবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র বা সমীকরণগুলো ব্যবহার করেন। এই সূত্র বা সমীকরণ গুলোকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন রাশি এবং একক ব্যবহার করা হয়। আবার রাশি বা এককগুলোকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সংকেত এবং প্রতীক ব্যবহার করা হয় এবং এর জন্য এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। শুধু পদার্থবিজ্ঞানেই নয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায় পরিমাপ করতে হলে আজকাল এককের আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ করা হয়।

এই বইয়ের এককের সংকেত ও বিভিন্ন রাশির মান প্রকাশ করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে-

১। কেনো রাশির মান প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা লিখে তারপর একটি ফাঁক (space) রেখে এককের সংকেত লিখতে হয়। যেমন '6.1 N', '5.5×10^3 cm', '30 sec'। একইভাবে শতকরা চিহ্ন (%) ও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন কোনের একক ডিগ্রী ($^\circ$), মিনিট ($'$) বা সেকেন্ড ($''$)। এই সকল ক্ষেত্রে সংখ্যা লেখার পর কোনো ফাঁক (space) থাকে না। যেমন, 30°।

২। গুণনে প্রাপ্ত লব্ধ একক লেখার সময় দুই এককের মাঝখানে একটি ফাঁক (space) দিতে হয়। যেমন, J s

৩। ভাগ দ্বারা গঠিত লব্ধ এককে ঋণাত্মক সূচক হিসেবে প্রকাশ করা হয়। যেমন, $\frac{\text{মিটার}}{\text{সেকেন্ড}}$ = মিটার/সেকেন্ড (m/s) (meter per second) বা ms^{-1}

৪। যেহেতু প্রতীকগুলো গাণিতিক প্রকাশ, কেনো কিছুর সংক্ষিপ্ত রূপ নয়। তাই এগুলোর শেষে কোন যতি চিহ্ন বা ফুল স্টপ (.) ব্যবহৃত হয় না।

৫। এককের সংকেত সোজা অক্ষরে লিখতে হয়। যেমন মিটারের (meter) জন্য m, সেকেন্ডের (second) জন্য s, ইত্যাদি। আবার কোনো রাশির সংকেত লিখতে হয় বাঁকা (Italic) হরফে যেমন, ভরের (mass) জন্য *m*, সরণকে (displacement) প্রকাশ করতে হয় *s* ইত্যাদি। এই সকল রাশির সংকেত ও এককের ফন্ট বিষয়বস্তুর ফন্টের (font) এর উপর নির্ভর করে না।

৬। এককের সংকেত ছোট হাতের হরফে লেখা হয়। যেমন, m, s, mol। তবে যেসব একক ব্যক্তির নাম থেকে নেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে সংকেত লেখার সময় (এক অক্ষর হলে) বড় হাতের হরফে বা প্রথম অক্ষর (একাধিক অক্ষরের হলে) বড় হাতের হরফে হবে। যেমন, জুলের নামানুসারে একক জুল লেখা হয় J। আবার বিজ্ঞানী প্যাস্কালের নামানুসারে প্যাস্কেল লেখা হয় Pa। তবে পুরো নাম লেখার সময় অবশ্যই ছোট হাতের হরফে লেখা হয় newton বা joule।

৭। এককের সংকেত কখনো বহুবচনে প্রকাশ করা হয় না। যেমন, 220 volt কে কখনো 220 volts লেখা হয় না।

৮। কোনো সংখ্যা বা যৌগিক একক বা সংখ্যা ও একক দুই লাইনে (line break) লেখা উচিত নয়। যদি খুব বেশী প্রয়োজন হয় তাহলে সংখ্যা ও একক দুইভাগ করে লেখা যেতে পারে।

৯। একাধিক উপসর্গ একসাথে ব্যবহার করা যায় না। যেমন, mmV লেখা যায় না, μV লিখতে হয়।

সার সংক্ষেপ ঃ

- **এককঃ** এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এস আই (SI) ইউনিট বলা হয়।
- মৌলিক রাশির একক সমূহ স্থান, কাল, পাত্র কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দীপন তীব্রতার একক কোনটি?
ক) অ্যাম্পিয়ার খ) মোল গ) ক্যান্ডেলা ঘ) নিউটন

২. নিম্নের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন।
i) 1 মিলিগ্রাম = 10^{-3} গ্রাম
ii) $[F] = MLT^{-2}$
iii) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ- ৪: পরিমাপের যন্ত্রপাতি : দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মিটার স্কেল ও ভার্ণিয়ার স্কেলের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন এবং এদের সাহায্যে কেনো বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্লাইড ক্যালিপার্সের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন এবং এদের সাহায্যে কেনো বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্ক্রু গজের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন এবং এর সাহায্যে কেনো বস্তুর ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পরিমাপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিমাপের যন্ত্রাদি :

আমরা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজে অতি ক্ষুদ্র হতে আরম্ভ করে বৃহৎ দূরত্ব পরিমাপ করতে হয়। তাই এ ক্ষেত্রে নির্ভুলতা অর্জনের জন্য প্রধানত এসব যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে । বৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে যেসব যন্ত্রাদি সচরাচর ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে কয়েকটি যন্ত্র সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক) মিটার স্কেল; খ) ভার্নিয়ার স্কেল; গ) স্লাইড ক্যালিপার্স; ঘ) স্ক্রু গজ; ঙ) তুলা যন্ত্র; চ) থামা ঘড়ি

ক) মিটার স্কেল :

দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগারে সাধারণত যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যন্ত্র হলো মিটার স্কেল। স্কেলটির দৈর্ঘ্য সাধারণত ১ মিটার বা ১০০ সেন্টিমিটার থাকে বলে একে মিটার স্কেল বলা হয়। স্কেলটির এক ধার সেন্টিমিটারে এবং অপর ধার ইঞ্চিতে দাগ কাটা থাকে। প্রত্যেক সেন্টিমিটার এবং প্রত্যেক ইঞ্চি সমান দশ ভাগে ভাগ করা থাকে। প্রত্যেক সেন্টিমিটারের প্রত্যেকটি ভাগকে ১ মিলিমিটার বা ০.১ সেন্টিমিটার বলা হয়। কোনো কোনো স্কেলে প্রত্যেক ইঞ্চিকে আট ভাগ বা ষোল ভাগে বিভক্ত করা হয়।

পরিমাপ পদ্ধতি :

মিটার স্কেলের সাহায্যে কোনো সরল বস্তুর দৈর্ঘ্য অতি সহজেই পরিমাপ করা যায়। যে দন্ড বা কাঠির দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তার এক প্রান্ত মিটার স্কেলের শূন্য (০) দাগে বা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করতে হবে। দন্ডের অপর প্রান্ত স্কেলের যে দাগের সাথে মিলে যাবে তার পাঠ নিতে হবে। অত:পর দন্ডের দুটি প্রান্ত পাঠের পার্থক্য হলো দন্ডের দৈর্ঘ্য। সাধারণভাবে বলা যায়, যে দন্ডের দৈর্ঘ্য মাপতে হবে তার এক প্রান্ত যদি X দাগে স্থাপন করা হয় এবং দন্ডের অপর প্রান্ত Y দাগের সাথে মিলে যায় তাহলে দন্ডের দৈর্ঘ্য L হবে X ও Y এর বিয়োগফল। অর্থাৎ L= Y- X । এই স্কেলের সাহায্যে মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। যদি এর চেয়ে সূক্ষ্ম পরিমাপ করতে হয়, তাহলে ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা হয়।

খ) ভার্নিয়ার স্কেল :

মিটার স্কেলে আমরা সাধারণত মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপতে পারি। মিলিমিটারের ভগ্নাংশ যেমন, 0.2 মিমি, 0.5 মিমি বা 0.9 মিমি ইত্যাদি মাপার জন্য আমাদের ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করতে হয়। ফরাসী গণিত শাস্ত্রবিদ পিয়েরে ভার্নিয়ার এই স্কেল উদ্ভাবন করেন। এজন্য তাঁর নামানুসারে এ স্কেলের নামকরণ করা হয় ভার্নিয়ার স্কেল।

মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের ভগ্নাংশের মান নিখুঁতভাবে নির্ণয় করার জন্য মূল স্কেলের পাশে ছোট আর একটি স্কেল ব্যবহার করা হয়। সেই ছোট স্কেলটির নাম ভার্নিয়ার স্কেল। মিটার স্কেলের সাথে ভার্নিয়ার স্কেল সংযুক্ত করে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।

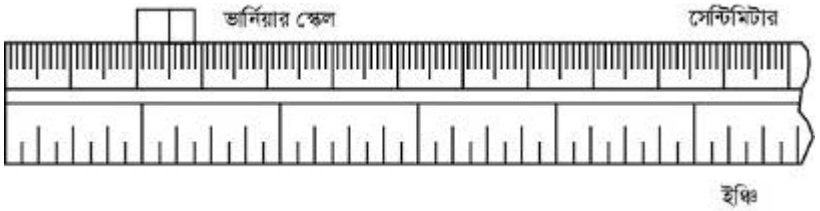

চিত্র: ১.১ ভার্নিয়ার স্কেল

ভার্নিয়ার স্কেল আকারে মূল স্কেল অপেক্ষা ছোট হয়। এই স্কেলটি মূল স্কেল বা প্রধান স্কেলের পাশে সংযুক্ত থাকে, ভার্নিয়ার স্কেলকে প্রধান স্কেলের পাশ দিয়ে সামনে বা পেছনে সরানো যায়। ধরা যাক, একটি ভার্নিয়ার স্কেলে দশটি ভাগ আছে। ভার্নিয়ার স্কেলের দশ ভাগ প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান। প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগের মান 9 মিলিমিটার বা 0.9 সেন্টিমিটার। যেহেতু ভার্নিয়ার স্কেলের 10 ভাগ প্রধান স্কেলের 9 ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান সেহেতু ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগগুলো প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের চেয়ে সামান্য ছোট। প্রধান স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্য এবং ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্যের পার্থক্যকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক (Vernier constant) V.C বলা হয়।

নিম্নের সূত্রের সাহায্যে ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়।

ভার্নিয়ার ধ্রুবক $= \frac{s}{n}$

যেখানে, s হল প্রধান স্কেলের এক ক্ষুদ্রতম ভাগের দৈর্ঘ্য এবং n হল ভার্নিয়ারের ভাগের সংখ্যা।

তাহলে, $s = 1$ মিমি এবং $n = 10$ ভাগ

$$\therefore \text{ভার্নিয়ার ধ্রুবক, V.C} = \frac{s}{n} = \frac{1 \text{ মিমি}}{10} = 0.1 \text{ মিমি} = 0.01 \text{ সেমি}$$

কোনো কোনো সময় ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের 19 ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান থাকে এবং প্রধান স্কেলের এক ক্ষুদ্রতম ভাগের মান 1 মিমি এর চেয়ে কম হয়। তখন ভার্নিয়ার ধ্রুবক পরিবর্তন হয়ে যায়। মূলত: ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মান নির্ভর করে প্রধান স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেলের দাগ কাটার উপর।

গ) স্লাইড ক্যালিপার্স :

ভার্নিয়ারের পরিমাপ পদ্ধতি অবলম্বন করে স্লাইড ক্যালিপার্স তৈরি করা হয় বলে একে ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সও বলা হয়। স্লাইড ক্যালিপার্সের মূল বা প্রধান স্কেল সাধারণত ইস্পাত দ্বারা নির্মাণ করা হয়। যার এক পার্শ্বে ইঞ্চি ও অপর পার্শ্বে সেন্টিমিটার এবং মিলিমিটারে দাগ কাটা থাকে। প্রধান স্কেলের যে প্রান্ত থেকে স্কেলের সূচনা হয় অর্থাৎ শূন্য দাগ কাটা থাকে সে প্রান্তটি ধাতব চোয়াল যুক্ত থাকে (চিত্র ১.২)। চোয়ালযুক্ত একটি ভার্নিয়ার স্কেল প্রধান স্কেলের সাথে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে। এই চোয়ালযুক্ত ভার্নিয়ার স্কেলটি প্রধান স্কেলের উপর সামনে বা পিছনে সরানো যায়। এই স্কেলের সাথে একটি স্ক্রু সংযুক্ত থাকে।

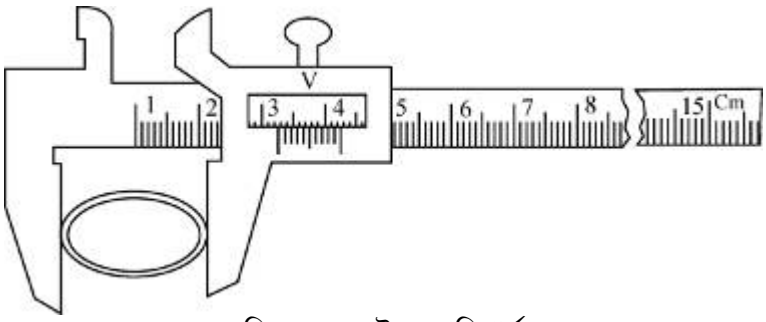

চিত্র: ১.২ স্লাইড ক্যালিপার্স

এই স্ক্রুর সাহায্যে ভার্নিয়ার স্কেলকে প্রধান স্কেলের সাথে যেকোনো জায়গায় আটকানো যায়। মূল স্কেলের চোয়াল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল পস্পরের সাথে লেগে থাকে, তখন সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। আবার অনেক যন্ত্রে মিলে না।

স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে পরিমাপ :

ধরা যাক, XY দন্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হবে। দন্ডটির X প্রান্ত প্রধান স্কেলের শূন্য (০) দাগের সাথে মিলিয়ে ভার্নিয়ার স্কেলটি সামনে বা পিছনে সরিয়ে Y প্রান্তের সাথে মিলানো হয়। মনে করা যাক, দন্ডের Y প্রান্ত স্কেলের M মিমি দাগ অতিক্রম করেছে। তাহলে, এর দৈর্ঘ্য M ও (M+1) মিমি এর মাঝামাঝি হবে। এ M মিমি এর চেয়ে বাড়তি দৈর্ঘ্য বের করতে ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করতে হয় এবং এর দৈর্ঘ্য টুকু হবে ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ।

অত:পর ভার্নিয়ারের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের কোন দাগের সাথে মিলছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি কোনো দাগ না মিলে তাহলে ভার্নিয়ারের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের কোনো একটি দাগের সবচেয়ে কাছাকাছি হয়েছে তা দেখতে হবে। ভার্নিয়ার স্কেলের এই দাগই হবে ভার্নিয়ার সমপাতন।

ধরা যাক, ভার্নিয়ারের V নম্বর দাগটি প্রধান স্কেলের যেকোনো একটি দাগের সাথে মিলেছে বা কাছাকাছি হয়েছে। যদি যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুবক V.C হয় , তাহলে

দন্ডের দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ

=প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন × ভার্নিয়ার ধ্রুবক

অর্থাৎ, $L = M + V \times V.C$

উদাহরণঃ

মনে করা যাক, দন্ডের Y প্রান্ত প্রধান স্কেলের 15 মিমি দাগ অতিক্রম করেছে এবং প্রধান স্কেলের একটি দাগের সাথে ভার্নিয়ারের 5 নম্বর দাগটি মিলেছে।

তাহলে দন্ডের দৈর্ঘ্য হবে,

$$L = 15 \text{ মিমি} + 5\times0.1 \text{ মিমি} \quad [\text{ ভার্নিয়ার ধ্রুবক}=0.1 \text{ মিমি}]$$
$$= 15 \text{ মিমি} + 0.5 \text{ মিমি}$$
$$=15.5 \text{ মিমি}$$
$$=1.55 \text{ সেমি}$$

প্রধান স্কেলের চোয়াল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল যখন লেগে থাকে তখন সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। আর যদি না মিলে তখন বুঝে নিতে হবে যন্ত্রটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি আছে। তাই এই ত্রুটির জন্য পাঠ সংশোধনের প্রয়োজন আছে।

ঘ) স্ক্রু গজ :

স্ক্রু গজকে মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজও বলা হয়। এটি ইস্পাত দ্বারা নির্মিত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তুর দৈর্ঘ্য, সরু তারের ব্যাস, সরু চোঙের ব্যাসার্ধ ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। এই যন্ত্রে U আকৃতির একটি কাঠামো থাকে (চিত্র ১.৩)। এই U আকৃতি বিশিষ্ট কাঠামোর দুই বাহুর প্রান্তে দুটি নল সংযুক্ত থাকে। একটি নলের মধ্য দিয়ে কীলক বা দন্ড A স্থায়ীভাবে আটকানো থাকে এবং অপর বাহুতে রয়েছে একটি ফাঁপা নল C, যার মধ্য দিয়ে একটি দন্ড B সংযুক্ত থাকে যা সামনে পেছনে সরানো যায়। C নলে মিলিমিটারে দাগাঙ্কিত একটি রৈখিক স্কেল থাকে। C নলের বাইরের অংশ অপর একটি ফাঁপা নল দ্বারা বেষ্টিত থাকে যার বহি:প্রান্তে একটি বেলনাকৃতির টুপি T থাকে। T এর কিনারকে সাধারণত 50 বা 100 ভাগ করা হয়। যখন B স্থায়ী কীলক বা সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দন্ড A কে স্পর্শ করে তখন বৃত্তাকার স্কেল শূন্য দাগ ও রৈখিক স্কেলের শূন্য দাগ মিলে যায়। যদি দুটি স্কেলের শূন্য দাগ মিলে না যায় তাহলে বুঝতে হবে যন্ত্রটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে।

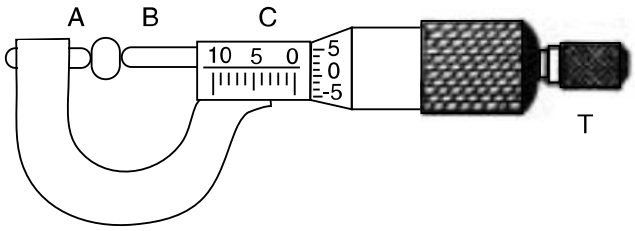

চিত্র : ১.৩ স্ক্রু গজ

টুপি T একবার ঘুরালে যতটুকু সরণ ঘটে এবং রৈখিক স্কেল বরাবরে যে দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে তাকে স্ক্রুর পিচ (pitch) বলা হয়। বৃত্তাকার স্কেলের মাত্র একভাগ ঘুরালে, এর প্রান্ত যতটুকু সরে আসে তাকে যন্ত্রের লঘিষ্ট গণন (Least count) L.C বলা হয়। স্পষ্টত: যন্ত্রের পিচকে বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যন্ত্রের লঘিষ্ঠ গণন পাওয়া যায়। সুতরাং

$$\text{লঘিষ্ঠ গণন} = \frac{\text{পিচ}}{\text{বৃত্তাকার স্কেলের ভাগের সংখ্যা}}$$

সাধারণত বৃত্তাকার স্কেলে 100 ভাগ থাকে এবং এই যন্ত্রে পিচ থাকে 1 mm

$$\therefore \text{ লঘিষ্ঠ গণন, } L.C = \frac{1 \text{ mm}}{100}$$
$$=0.01 \text{ mm}$$

ব্যবহার পদ্ধতি :

যে তারের ব্যাস পরিমাপ করতে হবে বা যে পাতের পুরুত্ব নির্ণয় করতে হবে সে বস্তুকে A ও B [চিত্র : ১.৩] এর মাঝে স্থাপন করতে হবে। তার বা পাতটি A ও B এর মাঝখানে এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে এর এক পাশ A কে এবং অপর পাশ B কে স্পর্শ করে। এবার T এর সাহায্যে দৃঢ়ভাবে বস্তুটিকে আটকাতে হবে। এখন বৃত্তকার এবং রৈখিক স্কেল পাঠ নিতে হবে। ধরা যাক, রৈখিক স্কেল পাঠ L মিমি এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা C। সুতরাং তারের ব্যাস বা পুরুত্ব হবে,

ব্যাস বা পুরুত্ব= রৈখিক স্কেল পাঠ + বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা×লঘিষ্ঠ গণন

$= L \text{ মিমি} + C \times L.C$

$= L \text{ মিমি} + C \times 0.01 \text{ মিমি}$

$= (L + 0.01C) \text{ মিমি}$

উদাহরন স্বরূপ, রৈখিক স্কেলের পাঠ 3 মিমি এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা 25, তাহলে

তারের ব্যাস $= 3 \text{ মিমি} + 25 \times 0.01 \text{ মিমি}$

$= (3+0.25) \text{ মিমি}$

$= 3.25 \text{ মিমি}$

স্ক্রু গজের সাহায্যে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়:

বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট কোনো তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি A হয়, তাহলে

$$A = \pi r^2 = \pi(\frac{d}{2})^2 = \frac{1}{4}\pi d^2$$

যেখানে, r =তারের ব্যাসার্ধ

এবং d = তারের ব্যাস

স্ক্রু গজের সাহায্যে তারের ব্যাস নির্ণয় করে উপরিউক্ত সূত্র ব্যবহার করে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল পরিমাপ করা যায়।

সার-সংক্ষেপ:

- মিটার স্কেলের দৈর্ঘ্য ১ মিটার বা ১০০ সেন্টিমিটার।
- মিলিমিটারের চেয়ে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা হয়।
- ক্ষুদ্র বস্তু যেমন সরু তারের ব্যাস মাপার জন্য স্ক্রু গজ ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে-

i) বেলনের আয়তন নির্ণয় করা হয়

ii) তারের ব্যাস নির্ণয় করা হয়

iii) ফাঁপা নলের অন্ত:ব্যাস নির্ণয় করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ল্যাবরেটরীতে একজন শিক্ষার্থী স্ক্রুগজের সাহায্যে একটি সরু তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল পেল 45.36×10^{-6} m^2

২. তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

ক) $A = \pi(\frac{r}{2})^2$ m^2 খ) $A = \pi\frac{r^2}{2}$ m^2

গ) $A = \pi(\frac{d}{2})^2$ m^2 ঘ) $A = \pi\frac{d^2}{2}$ m^2

৩. ব্যবহৃত তারের ব্যাসার্ধ কত?

ক) 3.2 cm খ) 3.1416 cm

গ) 3.8 cm ঘ) 3.2 mm

পাঠ- ৫ : পরিমাপের যন্ত্রপাতি : ভর ও সময়ের পরিমাপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- তুলা যন্ত্রের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন এবং এদের সাহায্যে কেনো বস্তুর ভর পরিমাপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- থামা ঘড়ির গঠন বর্ণনা করতে পারবেন এবং এর সাহায্যে কেনো ঘটনার সময় পরিমাপের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তুলা যন্ত্র :

পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নে খুব অল্প পরিমাণ জিনিসের ভর সূক্ষ্মভাবে মাপার প্রয়োজন হয়। তখন সাধারণ নিক্তির সাহায্যে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। বস্তু বা পদার্থের ভর যত কম হবে, তার ভর পরিমাপের জন্য তত সুক্ষ্ম নিক্তির প্রয়োজন হবে। এই রকম একটি নিক্তি হল তুলা যন্ত্র। পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের ল্যাবরেটরীতে খুব অল্প পরিমাণ নমুনার ভর পরিমাপ করতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কারণ ল্যাবরেটরীতে কোন জিনিসের ভর সঠিকভাবে পরিমাপ করতে না পারলে ঐ পরীক্ষণের ফলাফল ভুল আসতে পারে এবং পরীক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

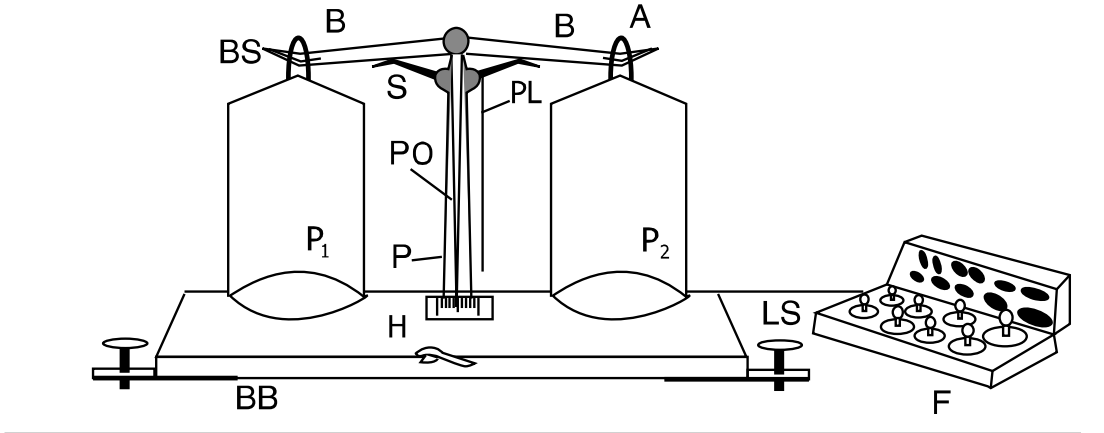

চিত্র : ১.৪ তুলা যন্ত্র

গঠন প্রণালী:

নিক্তির দুই প্রান্তে সাধারণ নিক্তির মত দুটি সমান ওজনের পাল্লা বা তুলাপাত্র (Scale pan) P_1 ও P_2 থাকে (চিত্র ১.৪)। একটি ধাতব দন্ড বা বিম AB এর দুই প্রান্তে দুটি খাঁজের মধ্যে উল্টানো ছুরির ফালের উপর দুটি সমান ওজনের ফ্রেমের সাহায্যে পাল্লা দুটি ঝুলানো থাকে। একটি ছুরি AB বিমের কেন্দ্রে আটকিয়ে দেয়া হয়, যা নিচের দিকে মুখ করে থাকে।

AB বিমটিকে একটি উলম্ব ফাঁপা থাম P-এর উপর স্থাপন করা হয় যাতে কাঠের ভিত বা পাটাতন BB এর মাঝখানে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। এই পাটাতনের সাথে তিনটি লেভেলিং স্ক্রু থাকে। এই স্ক্রুগুলোর সাহায্যে যন্ত্রটিকে লেভেলিং করা হয়। ফাঁপা থামটির মধ্যে একটি নিরেট ধাতব দন্ড থাকে যা পাটাতনের সংলগ্ন হাতল H ঘুরিয়ে উঠানো বা নামানো যায়।

একটি ত্রিকোণাকার অ্যাগেট পাথরের মোটা দিক বিম এর ঠিক মধ্যস্থলে আটকিয়ে সরু ধারটি থামটির নিরেট দন্ডের উপর অবস্থিত একটি অ্যাগেট প্লেটের উপর বসানো হয়। নিরেট দন্ডটিকে উপরে তুললে বিম AB অ্যাগেট পাথরের সরু দিকটাকে ফালক্রামে করে দুলতে থাকে।

তুলাদন্ডের মধ্যস্থলে একটি লম্বা সূচকের (PO) চওড়া দিকটা আটকিয়ে দিয়ে এর নিচের সরু প্রান্তটিকে একটি স্কেলের উপর মুক্ত রাখা হয়। যখন তুলাদন্ড অনুভূমিক অবস্থায় থাকে তখন সূচকের সরু প্রান্ত স্কেলের শূন্য(০) দাগের উপর থাকে। ওলনদড়ি (PL) এবং পাটাতনের নিচের স্ক্রু এর সাহায্যে দন্ডটিকে অনুভূমিক করা হয়। সমগ্র যন্ত্রটিকে একটি কাচের বাক্সে রাখা হয়।

তুলাযন্ত্রটি ব্যবহার করার সময় হাতল H ঘুরিয়ে থামটিকে উপরে উঠানো হয়। এতে AB বিমটি উপরে উঠে এবং ছুরির কিনারার উপর মুক্তভাবে দুলতে থাকে। দন্ডের সাথে পাল্লা দুটিও উপরে নিচে দুলতে থাকে। হাতল H কে উল্টো দিকে ঘুরালে থাম নিচে নেমে যায় এবং বিম AB ও পাল্লার দোলন থেমে যায়।

যখন AB বিম দুলতে থাকে তখন সূচক কাঁটাটি নিচের স্কেলের উপর ডানে বামে দুলতে থাকে। পাল্লায় কোন জিনিস না থাকলে সূচকটির দোলনের বিস্তার শূন্য দাগের দুপাশে সমান হবে। আর যদি দোলন শূন্য দাগের দুপাশে সমান না হয় তাহলে AB বিমের দুপাশে সমন্বয় স্ক্রু (BS) দ্বারা এমনভাবে সমন্বয় করে নিতে হবে যাতে সূচকের দোলন দুপাশে সমান হয়। ওলন রেখা PL দ্বারা থাম P উলম্ব হল কি'না তা দেখে নিতে হবে।

কোন বস্তু বা জিনিসের ভর মাপতে হলে বস্তুটিকে বামদিকের পাল্লায় রেখে ডানদিকের পাল্লায় ধীরে ধীরে একটা একটা করে বাটখারা রাখতে হয় যতক্ষন পর্যন্ত না সূচকটি শূন্য দাগের দুপাশে সমান দোলন দিতে থাকে। এভাবে জানা বাটখারার সাহায্যে অজানা বস্তুর ভর তুলাযন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

থামা ঘড়ি :

ক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধান পরিমাপ করার জন্য থামা ঘড়ি (stopwatch) ব্যবহার করা হয়। থামা ঘড়ি দুই প্রকার। যথা: ডিজিটাল থামা ঘড়ি এবং এনালগ থামা ঘড়ি। ডিজিটাল থামা ঘড়ি এনালগ থামা ঘড়ির চেয়ে নির্ভুল পাঠ দিতে পারে। এজন্য ডিজিটাল থামাঘড়ির ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে। যেখানে একটি এনালগ থামাঘড়ি ± 0.1s পর্যন্ত নির্ভুল পাঠ দিতে পারে সেখানে একটি ডিজিটাল থামা ঘড়ি ± 0.01s পর্যন্ত সঠিক পাঠ দিতে পারে। আজকাল ডিজিটাল ঘড়ি এবং মোবাইলে থামা ঘড়ি থাকে।

সময় পরিমাপ করার জন্য থামা ঘড়িটি হাত দিয়ে চালু করতে হয়, আবার বন্ধও করতে হয়। যেহেতু কাজটি হাত দিয়ে পরিচালনা করতে হয়, সুতরাং সময় ব্যবধানের পাঠে কিছুটা ত্রুটি চলে আসে।

পরিমাপে ত্রুটি ও নির্ভুলতা :

পরিমাপের সময় বিভিন্ন কারণে পরিমাপে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির এবং পরীক্ষকদের দক্ষতার উপর পরিমাপের নির্ভুলতা নির্ভর করে অর্থাৎ পরিমাপে ত্রুটির পরিমাণ কম হতে পারে। ধরা যাক, একটি মিটার স্কেল নেয় হল। স্কেলটিতে সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারে দাগ কাটা আছে। এই মিটার স্কেলটির সাহায্যে একটি বইয়ের দৈর্ঘ্য মাপা হলে পরিমাপটি নির্ভুল ধরে নেয়া যেতে পারে। আবার এই স্কেলের সাহায্যে যদি কোন ঘরের দৈর্ঘ্য মাপা হয় তাহলে ত্রুটির পরিমান বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। কারন এই ক্ষেত্রে স্কেলটি পরপর কয়েকবার বসিয়ে দৈর্ঘ্য মাপতে হবে।

পরিমাপের নির্ভুলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সব পরীক্ষকের পরীক্ষার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

যেমন, একটি তারের দৈর্ঘ্য যদি হয় 20cm তাহলে তারের দৈর্ঘ্য $20\text{cm} \pm 0.1\text{cm}$ লেখা যেতে পারে। এখানে $\pm$ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারের প্রকৃত দৈর্ঘ্য 19.9cm এবং 20.1cm এর মধ্যে হবে। সুতরাং 0.1cm হলো পরিমাপের অনিশ্চয়তা বা ত্রুটি।

পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো

ক) দৈব ত্রুটি

খ) যান্ত্রিক ত্রুটি

গ) ব্যক্তিগত ত্রুটি

ক) **দৈব ত্রুটিঃ** ধ্রুব রাশির মান সব সময় নির্দিষ্ট। কোনো ধ্রুব রাশিকে কয়েকবার পরিমাপ করলে যে ত্রুটির কারণে পরিমাপকৃত মানের অসামঞ্জস্য দেখা যায়, সেই ত্রুটিকে দৈব ত্রুটি বলা হয়। পরিমাপকৃত মানগুলো সঠিক মানের কিছুটা কমবেশী পাওয়া যেতে পারে এবং একই যন্ত্র দিয়ে একই রাশির মান বারবার পরিমাপ করে গড় মান নিলে এই ত্রুটির মান শূন্য হওয়া উচিত। যেমন রাস্তার দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মিটার স্কেল যতবারই বসানো হয় ততবারই দৈব ত্রুটির সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ স্কেলটি একবার বসিয়ে উঠানোর সময় স্কেলের সম্মুখ চিহ্নিত করার জন্য যে দাগ দেওয়া হয় অনেক সময় সামনে বা পিছনে হয়ে যায়। দৈব ত্রুটির ফলে চূড়ান্ত ফলাফল অত্যন্ত বেশী বা কম পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করলে এই ত্রুটির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব।

খ) **যান্ত্রিক ত্রুটিঃ** পদার্থবিজ্ঞানে বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য আমাদের বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার করতে হয়। সেইসব যন্ত্রে যদি কোন ত্রুটি থাকে তাকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলা হয়। যেমন পরীক্ষাগারে স্লাইড ক্যালিপার্স ব্যবহার করে থাকি। স্লাইড ক্যালিপার্সে যদি প্রধান স্কেলের শূন্য দাগ ভার্ণিয়ার স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে না যায় তাহলে ধরে নিতে হবে এই যন্ত্রে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে। তাই পরীক্ষণ শুরুর আগে এটি ভালভাবে দেখে নিতে হবে। যদি পুরোপুরি মিলে না যায় তাহলে ত্রুটির পরিমাণ হিসাব করে নিতে হবে।

গ) **ব্যক্তিগত ত্রুটিঃ** পরীক্ষণের সময় আমাদের বিভিন্ন পাঠ নিতে হয়। এই সময় পর্যবেক্ষকের কারনে পাঠে যে সব ত্রুটি আসে তাকে ব্যক্তিগত ত্রুটি বলা হয়। যেমন- দোলকের দোলনকাল নির্ণয়ের সময় যদি দোলন সংখ্যা নির্ণয় করতে ভুল হয় তাহলে সঠিক দোলনকাল পাওয়া যাবে না। এই সকল ব্যক্তিগত ত্রুটি দূর করার সময় যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সার-সংক্ষেপঃ

- খুব অল্প পরিমাণ পদার্থের ভর সুষমভাবে মাপার জন্য পরীক্ষাগারে তুলা যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।
- ক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধান পরিমাপের জন্য থামা ঘড়ি ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. যদি স্ক্রু গজের বৃত্তাকার স্কেলে 100 ভাগ এবং এই যন্ত্রে পিচ থাকে 1 মিমি তখন লঘিষ্ঠ গণন কত হবে?
ক) 0.1 মিমি খ) 0.01 মিমি গ) 0.001 মিমি ঘ) 1 মিমি

২. ঘরের দৈর্ঘ্য পরিমাপের সময় কোন ধরনের ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?
i) দৈব ত্রুটি
ii) যান্ত্রিক ত্রুটি
iii) যান্ত্রিক ত্রুটি ও ব্যক্তিগত ত্রুটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ঃ ৬

ব্যবহারিক -১: স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে আয়তাকার বস্তুর আয়তন নির্ণয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে একটি আয়তাকার বস্তুর কোনো পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য, কোনো পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও বস্তুর আয়তন নির্ণয় করতে পারবেন।

ব্যবহারিক ঃ ১: একটি আয়তাকার বস্তুর একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও বস্তুর আয়তন নির্ণয়।

উদ্দেশ্য ঃ স্লাইড ক্যালিপার্স ব্যবহার করে বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়।

সূত্র ঃ ক্ষেত্রফল হলো কোনো বস্তুর পৃষ্ঠের পরিমাণ। আর কোনো বস্তু যে স্থান দখল করে তাকে সেই বস্তুর আয়তন বলে। কোনো আয়তাকার বস্তুর কোনো পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল A এবং আয়তন V হলে,

$V = L \times A$... ... ... (i)

এবং $V = L \times B \times H$ ... ... (ii)

এখানে, L = বস্তুর দৈর্ঘ্য

B = বস্তুর প্রস্থ

H = বস্তুর উচ্চতা

স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে যে কোনো দৈর্ঘ্যের পাঠ নির্ণয়ের সূত্রঃ

দৈঘ্য= প্রধান স্কেল পাঠ *(M)* + ভার্ণিয়ার সমপাতন *(V)* × ভার্ণিয়ার ধ্রুবক *(VC)*

অর্থাৎ L বা B বা $H = M + V \times VC$

যন্ত্রপাতিঃ স্লাইড ক্যালিপার্স, আয়তাকার বস্তু।

কাজের ধারাঃ

১। স্লাইড ক্যালিপার্সটি নিয়ে এর প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান এবং ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা কত তা লক্ষ্য করুন। এরপর যন্ত্রটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করুন।

২। এবার আয়তাকার বস্তুটিকে দৈর্ঘ্য বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের মধ্যে স্থাপন করার পর চোয়াল দুটিকে দুপ্রান্তের সাথে স্পর্শ করুন। এই অবস্থায় ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের যে দাগ অতিক্রম করবে সেই দাগের পাঠই হলো প্রধান স্কেল পাঠ।

৩। এই অবস্থায় ভার্নিয়ার স্কেলের কোন দাগটি প্রধান স্কেলের যেকোনো একটি দাগের সাথে মিলে যায় তা নির্ণয় করুন। এটি হবে ভার্নিয়ার সমপাতন।

৪। এভাবে বস্তুটিকে দৈর্ঘ্য বরাবর বসিয়ে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়াটিকে পুনরাবৃত্তি করে পাঠ নিন এবং প্রাপ্ত মানগুলো ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

৫। এরপর বস্তুটিকে প্রস্থ বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়ার সাহায্যে কয়েকবার পাঠ নিন এবং ছকে স্থাপন করুন।

৬। আবার বস্তুটিকে উচ্চতা বরাবর স্লাইড ক্যালিপার্সের চোয়ালের মধ্যে স্থাপন করে ২ ও ৩ নং প্রক্রিয়া অনুযায়ী কয়েকবার পাঠ নিন এবং ছকে স্থাপন করুন।

৭। এরপর বস্তুটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা হিসাব করে মানগুলো (i) ও (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে আয়তাকার বস্তুটির একটি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করুন।

পর্যবেক্ষণ

ক. ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয়ঃ

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান, s =..... cm

ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা, n =..... cm

ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $VC = \frac{s}{n}$ =..... cm

খ. আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয়ের ছক

আয়তাকার বস্তুর	পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	প্রধান স্কেল পাঠ, M (cm)	ভার্নিয়ার সমপাতন V	ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC (cm)	পাঠ $M+V\times VC$ (cm)	গড় পাঠ (cm)
দৈর্ঘ্য L	1.					
	2.					
	3.					
প্রস্থ B	1.					
	2.					
	3.					
উচ্চতা H	1.					
	2.					
	3.					

গ. হিসাব ও ফলাফলঃ

আয়তাকার বস্তুর এক পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, $A = L \times B =$..... $cm^2 =$..... $\times 10^{-4}$ m^2
এবং আয়তন, $V = L \times B \times H =$..... $cm^3 =$..... $\times 10^{-6}$ m^3

পাঠ ঃ ৭

ব্যবহারিক-২ঃ স্ক্রু গজের সাহায্যে একটি বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি-

- স্ক্রুগজ ব্যবহার করে একটি বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট তারের ব্যাস, ব্যাসার্ধ ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবেন।

সূত্র ঃ ক্ষেত্রফল হলো কোনো বস্তুর পৃষ্ঠের পরিমাণ। কোনো তারের প্রস্থ বরাবর দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে ছেদ করলে যে তল পাওয়া যায় তার পরিমাণই হচ্ছে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল। কোন বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A হলে,

$A = \pi r^2$

এখানে, r = তারের ব্যাসার্ধ

$\pi = 3.14$; ধ্রুব সংখ্যা

এখন তারের ব্যাস d হলে $r = \frac{d}{2}$, সুতরাং

$A = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$

$\therefore A = \frac{1}{4}\pi d^2$ ... ... (i)

স্ক্রুগজের সাহায্যে যে কোন দৈর্ঘ্যের পাঠ নির্ণয়ের সূত্রঃ

দৈর্ঘ্য = রৈখিক স্কেল পাঠ *(L)* + বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা *(L)* $\times$ লঘিষ্ঠ গণন *(LC)*

অর্থাৎ $d = L + C \times LC$

যন্ত্রপাতি: স্ক্রুগজ, তার।

কাজের ধারাঃ

১। প্রথমে রৈখিক স্কেলের ক্ষুদ্রতম ঘরের মান ও বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দেখে নিন।

২। এরপর যন্ত্রের পিচ নির্ণয় করুন। বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণ একবার ঘুরালে এটি রৈখিক স্কেল বরাবর যে দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে তাকে যন্ত্রের পিচ বলা হয়। পিচ কে বৃত্তকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে লঘিষ্ঠ গণন (LC) বের করুন।

৩। এখন পরীক্ষণীয় তারটিকে স্ক্রুগজের স্থায়ী দন্ড ও স্ক্রুর মাঝখানে স্থাপন করে স্ক্রুটিকে একদিক বরাবর ঘুরিয়ে কীলক ও স্ক্রুকে আলতোভাবে তারের গায়ে স্পর্শ করতে হবে।

৪। এই অবস্থায় রৈখিক স্কেলের যে দাগটি বৃত্তাকার স্কেলের বামদিকে দেখা যায় সেই দাগটির পাঠ নিন। এটিই হলো রৈখিক স্কেল পাঠ (L)। এবার বৃত্তাকার স্কেলের যে দাগটি রৈখিক স্কেলের দাগের সাথে মিলে যায় সে দাগটির পাঠ নিন। এটি হলো বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা (C)।

৫। এভাবে তারটির বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার পাঠ নিয়ে ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

৬। এরপর প্রয়োজনীয় হিসাবের সাহায্যে তারের ব্যাস বের করে (i) নং সমীকরণে বসিয়ে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

পর্যবেক্ষণ

ক. লঘিষ্ঠ গণন নির্ণয়ঃ

রৈখিক স্কেলের এক ভাগের মান, s =..... mm

বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা, n =.....

পিচ (বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণ একবার ঘুরালে রৈখিক স্কেলে যে দৈর্ঘ্য অত্রিকম করে), p =..... mm

$\therefore$ লঘিষ্ঠ গণন, $LC = \frac{p}{n}$ =..... mm

খ. তারের ব্যাস নির্ণয়ের ছক

পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	রৈখিক স্কেল পাঠ, L(mm)	বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা, C	লঘিষ্ঠ গণন LC (mm)	ব্যাস, $d = L+C\times LC$ (mm)	গড় ব্যাস (mm)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

গ. হিসাব ও ফলাফলঃ

তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = \frac{1}{4}\pi d^2$ =..... mm^2 =..... $\times 10^{-6}$ m^2

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সজীব নবম শ্রেণীর ছাত্র। সে পদার্থবিজ্ঞান বই কিনে বইতে মাত্রা সমীকরণ দেখে বিষয়টি বুঝতে পারল না। এ জন্য সে তার শিক্ষকের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইল। তার শিক্ষক তাকে রাশি, বিভিন্ন রাশির মধ্যে সম্পর্ক, মাত্রা সমীকরণ এবং এর সাহায্যে সমীকরণের সত্যতা যাচাই ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলো। ফলে সে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারল এবং নিজে নিজে প্রয়োগ করার চেষ্টা করল।

ক) মাত্রা সমীকরণের সংজ্ঞা লিখুন। ১

খ) মৌলিক রাশি এবং লব্ধ রাশির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন। ২

গ) কাজের মাত্রা সমীকরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করুন। ৩

ঘ) মাত্রা সমীকরণের সাহায্যে সজীব কিভাবে নিম্নোল্লিখিত সমীকরণের সত্যতা যাচাই করল। সমীকরণটি হলো- ৪

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ ঃ ১. খ ২. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ ঃ ১. ক ২. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ ঃ ১. গ ২. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ ঃ ১. গ ২. গ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ ঃ ১. ক ২. খ